Vol. II, Issue-I, 2022
SKBU JOURNAL OF PHILOSOPHY
PEER REVIEWED

রাজা রামমোহনের দর্শনচিন্তায় ধর্মীয় সংস্কার ও সমাজ কল্যাণ

ডঃ মধুমিতা মিত্র

সারসংক্ষেপ

নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের যে যুগে আবির্ভাব ঘটেছিল সে যুগে ভারতবর্ষীয় সমাজ ছিল শাস্ত্রীয় অনুশাসন, ধর্মীয় প্রথা এবং সেই সম্পর্কিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দ্বারা পরিচালিত। মুক্ত চিন্তা ও যুক্তি-বুদ্ধির দ্বার ছিল রুদ্ধ । বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল নিজ ধর্মের বিধি-নিষেধ, উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদিকে চরম সত্য হিসাবে গ্রহণ করে পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত। বেদান্ত ও উপনিষদের অধ্যাত্মবাদী দর্শন, পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও হিতবাদী দর্শনের দ্বারা প্রভাবিত রামমোহন রায় উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষীয় সমাজের উন্নয়নের জন্য একান্ত আবশ্যক ধর্মীয় সংস্কার। সমাজকল্যাণ প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে তিনি দার্শনিক যুক্তি-তর্ক,বিচার-বিশ্লেষণের মাধ্যমে বিভিন্ন ধর্মের বিভেদপূর্ণ রী্তি-নীতি, বিধিনিষেধ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সমালোচনা করেছেন এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন ধর্মের মূল সত্য কে অবলম্বন করে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ধর্মীয় সম্প্রদায়গুলির মধ্যে সমন্বয় সাধনের প্রয়াস করেছেন। বিভিন্ন ধর্মমতের সংস্কার ও সমন্বয় সাধনের প্রচেষ্টায় রামমোহন তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধে ধর্মীয় সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে পরিচালিত রামমোহন রায় এর দার্শনিক যুক্তি-তর্ক, বিচার-বিশ্লেষণের উপর আলোকপাত করা হয়েছে এবং সেই প্রসঙ্গে তাঁর সংস্কারসাধন প্রকল্পের খণ্ডন ও গঠনমূলক – উভয়দিক আলোচিত হয়েছে। রামমোহন প্রবর্তিত ব্রাহ্ম সমাজের মূল উদ্দেশ্য ছিল সার্বভৌমিক মানবধর্ম প্রতিষ্ঠা - যার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়

ছিল- অহিতকর ধর্মীয় বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ সমাজের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হওয়া । প্রবন্ধে ধর্মীয় সংস্কারসাধনের সাথে যুক্ত রামমোহনের জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি পর্যালোচিত হয়েছে। রামমোহন রায় তাঁর দার্শনিক যুক্তিতর্ক এবং বিপুল সমাজসংস্কারমূলক কর্মকাণ্ডের দ্বারা প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছেন যে ধর্ম নয়, ধর্মের অপব্যাখ্যাই সমাজের ঐক্য ও সংহতির পরিপন্থী । তাঁর লক্ষ্য ছিল যথার্থ ব্যাখ্যার মাধ্যমে ধর্মকে বিভেদ এর শক্তির পরিবর্তে মিলনের শক্তি হিসাবে প্রতিষ্ঠা করা ।

মূল শব্দঃ ঈশ্বর, ধর্মীয় সংস্কার, সমাজকল্যাণ, যুক্তিবাদ, হিতবাদ, মানবতাবাদ

নবজাগরণের অগ্রদূত রাজা রামমোহন রায়ের যে যুগে আবির্ভাব ঘটেছিল সে যুগে একদিকে বাংলাদেশে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, অন্যদিকে ভারতবর্ষীয় সমাজ ছিল শাস্ত্রীয় অনুশাসন, ধর্মীয় প্রথা এবং সেই সম্পর্কিত অন্ধবিশ্বাস ও কুসংস্কারের দ্বারা পরিচালিত। মুক্ত চিন্তা ও যুক্তি - বুদ্ধির দ্বার ছিল রুদ্ধ। ফলে সমাজ ছিল ধর্মের ভিত্তিতে খণ্ডিত। নিজ ধর্মের বিধি - নিষেধ, উপাসনা পদ্ধতি ইত্যাদিকে চরম সত্য হিসাবে গ্রহণ করে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় ছিল পারস্পরিক বিবাদ ও সংঘর্ষে লিপ্ত। রামমোহন রায় উপলব্ধি করেছিলেন যে ভারতবর্ষীয় সমাজের উন্নয়ন জনমানসের উন্নয়ন ব্যতিরেকে সম্ভব নয় এবং জনমানসের উন্নয়নের জন্য একান্ত আবশ্যক ধর্মীয় সংস্কার। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে রামমোহন রায় ছিলেন জেমস্ মিল ও জেরেমি বেন্থামের সমসাময়িক। পাশ্চাত্য দর্শনের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি তাঁকে প্রভাবিত করেছিল। বেন্থামের মূল লক্ষ্য ছিল সমাজের হিতসাধন আইনের সংস্কার সাধনের মাধ্যমে, রামমোহন এর লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় সংস্কারের মাধ্যমে

সমাজের হিতসাধন । বর্তমান প্রবন্ধে রামমোহন রায় কীভাবে দার্শনিক যুক্তি - তর্ক, বিচার - বিশ্লেষণের মাধ্যমে সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সমালোচনা করে ধর্মীয় সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেই বিষয়ের প্রতি আলোকপাত করে হয়েছে। সেইসঙ্গে ধর্মীয় সংস্কার সাধনের সাথে যুক্ত তাঁর জনকল্যাণমূলক দৃষ্টিভঙ্গি এবং সেই দৃষ্টিভঙ্গির প্রাসঙ্গিকতা ও আলোচনা করা হয়েছে।

১

যে ভারতবর্ষে রামমোহন রায়ের জন্ম সেই ভারতবর্ষের সঙ্গে ইংল্যান্ড এর একটা বড় পার্থক্য এই যে, ভারত বর্ষ বহু ধর্মাবলম্বীর দেশ । ধর্মীয় রিতি-নীতি, বিধিনিষেধ কে অবলম্বন করে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাবের অভাব ছিল এবং সম্প্রদায়ের অভ্যন্তরেও বিরোধ তীব্র হয়ে উঠেছিল । হিন্দু সম্প্রদায় এবং শিখ সম্প্রদায়ের সঙ্গে মুসলমান সম্প্রদায়ের বিরোধ ছাড়াও হিন্দু সম্প্রদায় ছিল জাতিভেদ জনিত সাম্প্রদায়িক বিভেদ, কুসংস্কারাছন্ন নানা অমানবিক আচারে জর্জরিত। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে ধর্মীয় ভেদাভেদ এর সাথে যুক্ত হয়েছিল একদিকে যুক্তিবাদী দর্শনের আহবান, অন্যদিকে খ্রিষ্টধর্মের ভারতবর্ষে প্রসার লাভের প্রচেষ্টা ।

উদারপন্থী যুক্তিবাদী চিন্তাবিদ্ মাত্রেই অবগত যে সাম্প্রদায়িক বিরোধের কারণ হল ধর্মান্ধতা যার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ যে কোন দেশ সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক – প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পরতে বাধ্য । ইতিহাস এধরণের বহু ঘটনার সাক্ষী । ষোড়শ শতকে যদিও জার্মানি ছিল শিল্প-বানিজ্য-

সংস্কৃতিতে ইউরোপের অগ্রগণ্য দেশগুলির মধ্যে অন্যতম, সতের শতকে ক্যাথলিক ও প্রটেস্টান্ট সম্প্রদায়ের মধ্যে রক্তক্ষয়ী সংগ্রামের ফলে জার্মানির উন্নয়ন বহুকালের জন্য ব্যাহত হয়। তবে শুধু জার্মানি নয়, ইউরোপ এর বহুদেশের সমাজ জীবন সতের শতকে সাম্প্রদায়িক বিরোধের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হয় । ধর্মান্ধতার বিষময় ফলের ইতিহাস এই শিক্ষা দান করে যে ঃ ধর্মীয় সহিষ্ণুতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ ছাড়া কোন দেশ ও জাতির উন্নয়ন সম্ভব নয়। রাজনৈতিক ও সামাজিক ভাবে সচেতন রামমোহন রায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে সচেতন ছিলেন; সচেতন ছিলেন অন্যান্য দেশে এবং স্বদেশে ধর্মান্ধতার কুফল সম্পর্কে ও । ব্রিটিশ আধিপত্যের অধীনে তাই তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টা ছিল ধর্মীয় সংহতি স্থাপনের মাধ্যমে ভারতীয় জনমানস কে সামাজিক কল্যানের পথে পরিচালিত করা । অষ্টাদশ শতকের ব্রিটিশ উদারপন্থী দার্শনিক বেন্থামের বক্তব্য ছিল যে ব্যাক্তির কল্যাণ যেহেতু সমাজ কল্যাণের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত সেহেতু সমাজের সদস্যদের প্।রস্পরিক সহযোগিতার মাধ্যমেই ব্যাক্তি ও সমাজ – উভয়ের কল্যাণ সাধন সম্ভব। রামমোহন রায় কেবল বেন্থামের সমসাময়িকই ছিলেন না, বেন্থামের সাথে তাঁর চিন্তাভাবনার আদান-প্রদান ও ঘটেছিল । ব্যাক্তি কল্যাণ ও সমাজ কল্যাণ যে অঙ্গাঙ্গী সম্পর্কে আবদ্ধ সেই উপলব্ধি থেকে রামমোহন প্রতিটি মানুষের আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের কল্যাণ সাধনে ব্রতী হয়েছিলেন । তিনি লক্ষ্য করেছিলেন ব্যাক্তির আভ্যন্তরীণ উন্নয়নের জন্য জরুরি ধর্মীয় কুসংস্কারাছন্ন মনোভাবের সংস্কার সাধন । এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে যুক্তিবাদী

চিন্তাবিদরা যদিও সহযোগিতার মাধ্যমে সমাজের কল্যান সাধনের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন, তাঁদের যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি কোন বিশেষ ব্যাক্তি বা সম্প্রদায়ের প্রতি নির্বিচার আনুগত্য স্বীকার করে না ।রামমোহনের ধর্মীয় সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টায় সেই দৃষ্টিভঙ্গি ই প্রতিফলিত হয়েছে ।

২

রামমোহনের ধর্মীয় সংস্কারসাধনের দুটি দিক ঃ ১) গঠনমূলক দিক অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মমতের সমন্বয় সাধনের দিক ও ২) সমালোচনার দিক অর্থাৎ বিভিন্ন ধর্মের কুসংস্কারাচ্ছন্ন রীতি – নীতি, বিধি-নিষেধ ব্যাবস্থার খণ্ডন । রামমোহনের যুক্তিবাদী ধর্মচিন্তার প্রথম পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর ফারসি রচনা "তুহফাত – উল – মুওয়াহহিদিন" এ । "তুহফাত" এ আমরা তাঁর ধর্মীয় সংস্কার এর দ্বিতীয় দিক টির সাথে পরিচিত হই যেখানে তিনি সংস্কারসাধনের উদ্দেশ্যে বিভিন্ন ধর্মের কুসংস্কারাছন্ন বিধি নিষেধ ও সাম্প্রদায়িক মনোভাবের সমালোচনা করেছেন দার্শনিক বিচার বিশ্লেষণের মাধ্যমে ।

রামমোহনের মতে প্রত্যেকটি ধর্মের দুটি দিক রয়েছে ঃ ১) ধর্মের অন্তরঙ্গ দিক অর্থাৎ আধ্যাত্মিক দিক যেখানে ধর্মের মুল সত্য নিহিত রয়েছে । এই মূল সত্য হল নিরাকার পরমেশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস স্থাপন । ২) ধর্মের বহিরঙ্গ দিক অর্থাৎ ধর্মীয় রীতিনীতি, বিধিনিষেধ সংক্রান্ত ব্যাবস্থা । ধর্মের আধ্যাত্মিক দিক সম্পর্কে রামমোহন " মনজারাতুল আদিয়ান" গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে সকল ধর্মের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল – জগতের সকল কিছুর আদিকারণ রূপে এবং সকল কিছুর বিধাতারূপে

পরমসত্ত্বার অস্তিত্বে বিশ্বাস । এই বিশ্বাস সার্বজনীন এবং এই বিশ্বাসের পরিপ্রেক্ষিতে ধর্মমতগুলির মধ্যে কোন বিরোধিতা নেই। তাঁর মতে সৃষ্টির আদিকারণরূপে এক অনন্তসত্ত্বার দিকে মানুষ স্বভাবগতভাবে চিন্তায় ও মননে ধাবিত হয় । ধর্মমতগুলির মধ্যে বিরোধিতা সৃষ্টি হয় যখন অন্তরঙ্গ সাধনার পরিবর্তে বহিরঙ্গ সাধনার দিক্ কে অর্থাৎ ধর্মীয় বিধি নিষেধ রীতিনীতি পালনকে ধর্মের মুল সত্য হিসাবে গ্রহণ করে অনন্তসত্ত্বার প্রতি ধর্মভেদে "বিশেষ বিশেষ স্বরূপ লক্ষ্মণ" আরোপিত হয় । রামমোহনের মতে অনন্তসত্ত্বার প্রতি কোন বিশেষ গুণ আরোপ , কোন বিশেষ উপাসনা বা পূজা পদ্ধতি গ্রহন, এক দেবতা কিংবা বহু দেবতায় বিশ্বাস, বিভিন্ন ধর্মীয় বিধি – নিষেধ পালন – এসকলই দলগত শিক্ষা ও অভ্যাসের ফল, যা গোষ্ঠীজীবনের ধর্মাচরণ থেকে উদ্ভূত এবং এই ধর্মাচরণগুলির মধ্যে ধর্মের মূল সত্য নিহিত নয় । সুতরাং যদি বিশেষ উপাসনা পদ্ধতি ও ধর্মীয় আচার আচরণকেই ধর্মের মূল সত্য হিসাবে গ্রহণ করা হয় তাহলেই সৃষ্টি হয় ধর্মীয় বিদ্বেষ ও দুর্নীতি যা মানবসভ্যতা ও সমাজ কল্যাণের প্রতিবন্ধক ।

রামমোহন রায়ের জীবনের ব্রত ছিল ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ববোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের সামগ্রিক কল্যাণ সাধন । সুতরাং ধর্মীয় ভ্রাতৃত্ব বোধ প্রতিষ্ঠার পথে যে সমস্ত ধর্মীয় অনুশাসন ও বিশ্বাস যৌক্তিক ও নৈতিক ভাবে অসঙ্গত ও প্রতিবন্ধক মনে হয়েছে, সেগুলিকে তিনি কঠোর ভাষায় সমালোচনা করেছেন । ভ্রাতৃত্ব বোধের অন্তরায় হিসাবে তিনি নিম্নে উল্লিখিত ধর্মীয় বিশ্বাস ও তৎসম্পর্কিত আচরণের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ঃ

ক) বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন ধর্মগুরু ও পয়গম্বর দের কে ঈশ্বরের দূত হিসাবে গ্রহণ করে নির্বিচার আনুগত্য স্থাপন এবং ধর্মীয় নেতাদের অলৌকিক ক্ষমতায় বিশ্বাস পোষণ ।

খ) ধর্মীয় আচার – আচরণ , বিধি – নিষেধ ইত্যাদির ভিন্নতার পরিপ্রেক্ষিতে বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের পরস্পরকে ভ্রান্ত প্রমাণের চেষ্টা, স্বীয় ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা, ধর্মান্তরকরণের প্রচেষ্টা এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের কে নির্যাতন করা ইত্যাদি ।

গ) শৌচাশৌচ পানাহার সংক্রান্ত রীতিনীতি কে ধর্মীয় বিধিনিষেধ এর সাথে যুক্ত করে স্বীয় ধর্মাবলম্বী এবং ভিন্ন ধর্মাবলম্বী উভয়ের প্রতি অমানবিক আচরণ করা ।

তুহফাত –উল- মুওয়াহহিদীন এ রামমোহন দার্শনিক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে উপরোক্ত বিশ্বাস ও তৎসম্পর্কিত আচরণগুলিকে সমালোচনা পূর্বক খণ্ডন করেছেন ।

ঈশ্বরের দূত হিসাবে ধর্মগুরু এবং পয়গম্বর দের কে গ্রহণ করার বিপক্ষে তাঁর যুক্তিগুলি হল ঃ

১) ধর্মের মূল সত্যের বৈশিষ্ট্য হল সার্বিক স্বীকৃতি । সেই বৈশিষ্ট্য বিভিন্ন ধর্মমতের পয়গমবর দের নেই; কেবলমাত্র ঈশ্বর বিশ্বাসীদের কাছে ঈশ্বরের সার্বিক স্বীকৃতি আছে । কারণ, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম ভিন্ন ভিন্ন ব্যাক্তি কে সত্য ধর্মের পথ প্রদর্শক হিসাবে স্বীকৃতি দেয়, তাছাড়া কোন জাতি যাকে সত্য ধর্মের পথ প্রদর্শক হিসাবে মর্যাদা দেয়, অন্যজাতি তাকে ভুল পথের নির্দেশক হিসাবে প্রত্যাখ্যান করে ।

২) বিভিন্ন ধর্মে ধর্মগুরু বা পয়গম্বর দের কে ঈশ্বরের অবতার বা দূত হিসাবে গ্রহণ করা হয় এই বিশ্বাসে যে ঈশ্বর তাঁদের মাধ্যমে ইহগজগতের জনসাধারণ কে সঠিক পথে পরিচালনা করেন । কিন্তু এধরণের বিশ্বাস মহান স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বরে বিশ্বাসের পরিপন্থি, সুতরাং স্ববিরোধিতা দোষে দুষ্ট । কারণ ধর্ম নির্বিশেষে ঈশ্বর বিশ্বাসীরা দাবি করেন যে জগতের ভাল –মন্দ সব কিছুই মহান সৃষ্টিকর্তা সরাসরিভাবে সৃষ্টি করেছেন, কোন "মধ্যবর্তী" র সাহায্য ছাড়াই ।

৩) ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মগুরু বা পয়গম্বরদের প্রয়োজনীয়তা অসিদ্ধ কারণ ঈশ্বরের বাণী যদি তাঁদের কাছে সরাসরি প্রকাশিত হয় তাহলে প্রমাণিত হয় যে সাধারণ মানুষের কাছে ঈশ্বরের বাণী সরাসরি প্রকাশিত হতে পারে । এক্ষেত্রে কোন "মধ্যবর্তী" র অস্তিত্ব নিষ্প্রয়োজন ।

৪) ঈশ্বরের প্রতিনিধি হিসাবে ধর্মগুরু বা পয়গম্বরদের প্রয়োজনীয়তার স্বীকৃতি "অনাবস্থা দোষ" এ দুষ্ট । কারন, যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে পয়গম্বর দের অস্তিত্ব অন্যান্য জাগতিক বস্তুর মতই ঈশ্বরের অস্তিত্ব থেকে স্বতন্ত্র । সুতরাং, ঈশ্বর ও সাধারণ মানুষের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপনের জন্য যদি কোন ও "মধ্যবর্তী" র অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় সেই "মধ্যবর্তী" র সঙ্গে ঈশ্বরের সম্পর্ক স্থাপনের জন্য অন্য কোন ও "মধ্যবর্তী" র অস্তিত্ব স্বীকার করা প্রয়োজন হবে । এভাবে চলতে থাকলে "অনবস্থা" দোষ অবশ্যম্ভাবী ।

তুহফাৎ - উল- মুওয়াহ্হিদীন" এ রামমোহন রায় ধর্মীয় রীতি-নীতি, বিধি - নিষেধ ব্যবস্থা কে কেন্দ্র করে ধর্মীয় সম্প্রদায় গুলির পারস্পরিক দ্বন্দ্ব ও শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা কে দার্শনিক যুক্তি তর্কের মাধ্যমে খন্ডন করেছেন। যুক্তিগুলি নিম্নরূপ :

১) ধর্মীয় রীতি নীতি র ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক দ্বন্দ্ব ধর্মগুলির মধ্যে নিহিত মূল সত্যের বিরোধিতা করে। কারণ, সংঘর্ষে লিপ্ত ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা অন্তরে " পবিত্রতা ও সরলতার" পরিবর্তে " "পক্ষপাত ও অপ্রেমের" বীজ বপন করে - যা পরমেশ্বরের আরাধনার অন্তরায়।

২) বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায়ের নিজ ধর্মমত এর শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণের প্রচেষ্টা বাস্তবতা বোধ বর্জিত এবং অযৌক্তিক। কারণ, ধর্ম নির্বিশেষে সকল মানুষের প্রাকৃতিক, শারীরিক এবং মানসিক স্বাচ্ছন্দ্য বা দুর্ভোগ এর অভিজ্ঞতা একই ধরণের হয়।

৩) ধর্মীয় বিধি নিষেধ সংক্রান্ত অমিলের ভিত্তিতে কোনো বিশেষ ধর্মীয় সম্প্রদায়ের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করার প্রচেষ্টা অযৌক্তিক। কারণ বিধি নিষেধ সংক্রান্ত অমিলের ভিত্তি হলো নিছক বিশ্বাস - যার কোনো বস্তুগত সত্যতা নেই। যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে কেবলমাত্র উপযুক্ত যুক্তিই কোনো ধর্মীয় বিধি নিষেধ সংক্রান্ত ব্যবস্থা কে ভ্রান্ত বা অভ্রান্ত প্রমাণ করতে সক্ষম। নিছক বিশ্বাসের অমিল কখনই উপযুক্ত যুক্তি হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয় ।

৪) পূর্বপুরুষদের মতামতের ভিত্তিতে কোনো ধর্মীয় সম্প্রদায়ের বিধি নিষেধ সংক্রান্ত ব্যবস্থা কে নির্ভুল প্রতিপন্ন করার প্রচেষ্টা ও অযৌক্তিক। কারণ, পূর্বপুরুষদের মতামতের যাথার্থ্য ও প্রমাণ সাপেক্ষ।

৫) শৌচা শৌচ ও পানাহার সংক্রান্ত রীতি নীতি কে ধর্মীয় বিধি নিষেধ এর সাথে যুক্ত করাকে রামমোহন কঠোর ভাষায় সমালোচনা করে বলেছেন এই বিধি নিষেধগুলি কেবল অসার বা নিরর্থকই নয়, কুসংস্কার ও অন্ধবিশ্বাসের দ্বারা আবৃত হওয়ার দরুন অনুসরণকারীকে শারীরিক ও মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে সমাজের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে ।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতিপন্ন হয় যে রামমোহনের দার্শনিক চিন্তাভাবনার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গি । তিনি তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিভঙ্গির সাহায্যে যেভাবে হিন্দু ধর্মের অন্ধবিশ্বাস, পৌত্তলিকতা, কুসংস্কার, অবতারবাদ ইত্যাদির নিন্দা করেছেন, তেমনি খ্রিষ্টানদের যীশুর জন্মসংক্রান্ত অলৌকিক বৃত্তান্ত ও ত্রিত্ববাদ গ্রহণ করেননি , তেমনি কোরানের পৌত্তলিকদের প্রতি নির্যাতনের আদেশ তিনি ঘৃণার সাথে বর্জন করেছেন ।

তবে কেবল যুক্তি নয়, রামমোহন তাঁর "তুহফাত –উল- মুওয়াহহিদীন" এ স্পষ্ট ভাষায় ব্যাক্ত করেছেন যে ধর্মের বিশুদ্ধ সত্য উপলব্ধি করা সম্ভব যদি তা উপলব্ধি করার হৃদয় এবং জ্ঞানচক্ষু উভয়ই থাকে ।কিন্তু যদি "বাধ্যতা" ও "দাসত্বের" বেড়াজালে আবদ্ধ হওয়ার দরুন কারো জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত না হয় এবং সত্য উপলব্ধি করার হৃদয় হারিয়ে যায়, তাঁর পক্ষে কখনই "সত্যিকার মঙ্গল" ও "সুস্পষ্ট

পাপের" মধ্যে পার্থক্য করা সম্ভব নয় । রামমোহনের সত্যাশ্রয়ী জ্ঞানচক্ষু ও হৃদয় তাঁকে সকল ধর্মের মূল সত্য আবিষ্কার করতে সহায়তা করেছিল । বেদ, কোরান ও বাইবেল – এই তিনটি ধর্মশাস্ত্র পাঠ করে রামমোহন রায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে এই তিনটি শাস্ত্রের মধ্যেই মহাসত্য নিহিত রয়েছে এবং সেই মহাসত্য হল – এক অদ্বিতীয় পরমেশ্বরে বিশ্বাস ও মানবের হিতসাধন । সুতরাং তাঁর মতে সত্যিকারের ধর্মপালন হল – অহিতকর ধর্মীয় বিধি নিষেধ থেকে মুক্ত হয়ে পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠাসহ সমাজের কল্যাণ সাধনে নিযুক্ত হওয়া ।

৩

রামমোহনের যুক্তিনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গির সাথে যুক্ত হয়েছিল বিশ্বজনীন মানবতা এবং এরই ফলস্বরূপ বাহ্য আচারঅনুষ্ঠান মুক্ত সকল ধর্মের মূল সত্যের আলোকে প্রবর্তিত হয় সার্বভৌমিক মানবধর্ম । ১৮২৮ সালের ২০ অগাস্ট রামমোহন ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠা করেন । ধর্মের মূল সত্য কে অবলম্বন করে ব্রাহ্ম সমাজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে তিনি বিভিন্ন ধর্মীয় সম্প্রদায় কে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে বাঁধতে চেয়েছিলেন । ব্রাহ্মসমাজের মূল লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় ভ্রাতত্ব বোধ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজের কল্যান সাধন এবং আদর্শ আচরণের মাপকাঠি ছিল ধর্মীয় সভ্যতা । ধর্মীয় সভ্যতা দাবি করে যে প্রত্যেক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের সদস্যগণ ধর্মান্ধতা ও গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হয়ে নিজ নিজ ধর্মাচরণকে সংশোধন করার চেষ্টা করবে এবং অন্য ধর্মের প্রতি সহিষ্ণুতার মনোভাব পোষণ করবে । রামমোহন ব্রাহ্মসমাজের "Trustee Deed" এ

লিখেছেন – " যে কোন ব্যাক্তি ভদ্রভাবে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধার সঙ্গে উপাসনা করতে আসবেন , এই সাধারনের মিলন মন্দির তাঁর ই জন্য উন্মুক্ত, তিনি যে দেশের বা জাতির বা ধর্মের লোকই হোন না কেন ।" রামমোহন যদি ও শাস্ত্র মানতর, তাঁর ব্রাহ্মসমাজ কোন শাস্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত নয় । যুক্তির সাহায্যে শাস্ত্র বিচার করে, ধমগুলিকে অর্থহীন আচার ও অনুষ্ঠান সর্বস্বতা থেকে মুক্ত করে ব্যাক্তিমনের বুদ্ধিদীপ্ত অন্তর্লোকে প্রতিষ্ঠা করাই ছিল তাঁর অভিপ্রায় ।

সমাজ হিতৈষণা, বিশ্বজনীনতা ও ভ্রাতৃত্ববোধ এ উদবুদ্ধ হয়ে রামমোহন ধর্মীয় সংস্কার সাধনের মাধ্যমে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক সংস্কার সাধনেও নিযুক্ত হয়েছিলেন । তাঁর সময়ে যেহেতু ধর্মীয় অনুশাসনের অধীন ছিল সামাজিক অনুসাশন, তাই তিনি শাস্ত্রের সাহায্যেই যে সমস্ত অনুশাসন মানবকল্যানের পরিপন্থি, সেগুলি বর্জন করার অথবা সংস্কার সাধন করার আহবান জানিয়েছিলেন । যদিও বলা হয় যে রামমোহন শাস্ত্র ও যুক্তি উভয়ই মানতেন এবং এ দুয়ের মধ্যে সমন্বয় সাধন করার চেষ্টা করেছিলেন, রামমোহনের বিপুল সামাজিক ও রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড প্রমাণ করে যে তিনি যুক্তিকে শাস্ত্রের চাইতে বেশি প্রাধান্য দিয়েছেন । তিনি যদিও ধর্মীয় ও সামাজিক সংস্কার সাধনের জন্য শাস্ত্রের সাহায্য নিয়েছেন শাস্ত্রের যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যার মাধ্যমে, নীতি, ধর্ম ও যুক্তির স্থান ছিল তাঁর কাছে শাস্ত্রের উর্দ্ধে । মানবিকতা কে শাস্ত্রের উর্দ্ধে স্থান দিয়েছিলেন বলেই শাস্ত্রনিষিদ্ধ অথচ সমাজহিতকর প্রথা প্রচলনের সমর্থনে মত প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর বক্তব্য ছিল যে ব্রহ্মনিষ্ঠ ব্যাক্তিদের

পক্ষে লোকের হিতসাধনই সনাতন ধর্ম । সুতরাং সেই সনাতন ধর্ম অনুসারে কোন হিতকর প্রথা শাস্ত্র কর্তৃক নিষিদ্ধ হলেও প্রবর্তন করা যুক্তিযুক্ত । সুতরাং রামমোহনের পরমেশ্বর কেবল আধ্যাত্মিক সত্তাই নন, নৈতিক সত্তা ও বটে ; এমন কোন প্রথা, বিধি- নিষেধ , রীতি – নীতি পরমেশ্বর কর্তৃক বিহিত হতে পারে না – যা অমানবিক এবং সমাজের জন্য অকল্যাণকর ।

রামমোহনের দার্শনিক চিন্তায় ঈশ্বরপ্রেম ও মানবমুখিনতা ছিল ওতপ্রোতভাবে জড়িত । তাঁর যৌক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি পরিচালিত হয়েছিল মানবকল্যানের দ্বারা এবং তাঁর মানবকল্যানের ধারণা ছিল একমেবাদ্বিতীয়ম পরমেশ্বরের প্রেম ও অনুভূতিতে সিক্ত । পরমেশ্বরের চরমসত্তা স্বীকার করার মধ্য দিয়ে তিনি উপলব্ধি করেছিলেন সীমাহীন বৃহৎ বিশ্বের সঙ্গে যুক্ত হবার সামর্থ্য ও আকাঙ্খা । জগতের সীমা ভেঙ্গে অসীমতার আস্বাদ অনুভব এবং অসীমের অনুভূতির মাধ্যমে জগতের ঐক্য উপলব্ধি – এ সকলই প্রকাশিত হয়েছে তাঁর ব্রহ্মোপাসনা ও সমাজহিতৈষীমূলক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে ।

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে ধর্মের যথার্থ অর্থ যদি হয় সদাচার ও সুনীতি পালনের মাধ্যমে সমগ্র মানবসমাজকে ধারণ করা তাহলে রামমোহন রায় ধর্ম কে যথার্থ অর্থে গ্রহণ করেছিলেন । তাঁর দৃষ্টিতে যথার্থ ধর্ম হল – পরমেশ্বরের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ও পারস্পরিক ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে সমাজের কল্যাণমূলক কর্মে নিযুক্ত হওয়া । লক্ষ্যণীয় যে, কেবলমাত্র এই অর্থেই

ধর্ম মানবসমাজের ধারক ও বাহক হতে পারে । সুতরাং রামমোহন রায়ের ধর্মীয় সংস্কারসাধনের প্রচেষ্টা দেশ – কাল নিরপেক্ষভাবে মূল্যবান ।

তবে আক্ষেপের বিষয় এই যে, যদি ও রামমোহন রায়ের জীবৎকালের প্রায় ২০০ বছর অতিক্রান্ত হতে চলেছে, তাঁর আবির্ভাবকালে যেভাবে ধর্মীয় ভেদাভেদ ও অস্পৃশ্যতা ভারতের জনমানস কে অধিকার করে রেখেছিল আজ ও এদেশের জনমানস সেই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত হতে পারেনি । আজ ও ভারতের বিভিন্ন শহরে ও গ্রামাঞ্চলে ধর্মীয় রীতি নীতি, বিধি নিষেধ পালন করা কে মুখ্য কর্তব্য হিসাবে গ্রহণ করে মানবিকতা কে বিসর্জন দেবার দৃষ্টান্ত, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নয়ন রোধ করার দৃষ্টান্ত প্রতুল । বাস্তব সত্য এই যে, ধর্মীয় সংকীর্ণতা মুক্ত যে মানবসমাজের গঠন ও রূপায়নে রামমোহন রায় ব্রতী ছিলেন সেই মানবসমাজ বহু দেশের উদার, যুক্তিনিষ্ঠ মানবমনের কাছে আজ ও কাঙ্খিত হলেও অধরা ।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১) ঘোষ, অজিতকুমার, (সম্পা.) *রামমোহন রচনাবলী* , হরফ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৩

২) চট্টোপাধ্যায়, নগেন্দ্রনাথ, *মহাত্মা রামমোহন রায়ের জীবন চরিত* , দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, ১৯২৮

৩) রায়, শিবনারায়ণ, (সম্পা.)*রামমোহনঃ অন্ধকারের উৎস হতে , ইউনিমেজ, কলকাতা, ২০১৯*

৪) বিশ্বাস, দিলীপকুমার, *রামমোহন-সমীক্ষা* , ব্রাহ্মমিশন প্রেস, কলিকাতা , মার্চ, ১৩৭৩